চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি

ইব্রাহিম কালিন

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

ইবনে খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন চমৎকার একটি আয়োজন বাস্তবায়ন করার জন্য; সেই সাথে আমাকে আমন্ত্রণ করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি ICYF কেও অভিনন্দন জানাচ্ছি এমন একটি ক্ষণে মজলিসটি আয়োজন করবার জন্য, যখন আমি প্রগাঢ় চিন্তার চর্চা এবং মুসলিম চিন্তকদের অভাব বোধ করছি। তাই আমি এ বিষয়ের উপর আজকে আলোচনা করাটা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

তবে চিন্তা কী, চিন্তার সাথে আরো কি কি বিষয় সম্পৃক্ত আছে, এবং □ইসলামি আইডেন্টিটি□ প্রশ্নে চিন্তা কিভাবে অন্ধকারের মুখে পতিত □ এ বিষয়ে আলাপ তোলার আগে আমি আবার ইবনে খালদুন বিশ্ববিদ্যালয় টিমের তারিফ করছি এমন উঁচু মানের একটি কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য। কিছুক্ষণ আগে আমাকে অবহিত করা হলো যে- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সামগ্রিক পরিকল্পনায় গ্রাজুয়েট লেভেলের শিক্ষাকে অধিক গুরুত্বের জায়গায় রেখে এগুচ্ছেন। আমার সে মুহূর্তে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এরিক শুমাচারের একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে গেল যেটাকে তিনি তাঁর বইয়ের শিরোনাম হিসেবেও ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, □অল্পই সুন্দর□। সুতরাং আমি বলব, আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছোট রাখেন তবে গুণগত মানের দিক থেকে তা হোক উন্নত। ভাল কিংবা প্রাসাঙ্গিক হওয়ার জন্য আপনাকে আসলেই বড় কিছু করতে হবে না; বরং আমি মনে করি ইতোমধ্যে অনেক বড় বড় প্রকল্প চলছে যা কেবল সংখ্যার দিক থেকে বড় হচ্ছে, গুণ গত মানের দিক থেকে নয়। এখানে রেনে গেনন এর □The Reign of Quantity and the Signs of Time□ বইয়ের আলাপটি তোলা যায়□ □আর সংখ্যা যত বড় হয়, আমি মনে করি, অবনতির লক্ষণ তত ঘনিয়ে আসে"। তাই বিশ্ববিদ্যলয়টিকে ছোট কিন্তু গভীর, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। আমার বিশ্বাস আপনারা সেটাই করছেন। চলুন এবার আজকের মূল আলোচনায় ফেরা যাক।

আমি মনে করছি এখন আমাদের নিজেদেরকে পয়লা যে প্রশ্নটি করা দরকার তা হচ্ছে- □চিন্তা□ কী? আমরা কথা বলছি □মুসলিম-ভবিষ্যৎ□ অথবা □ভবিষ্যৎ-মুসলিম-চিন্তক□ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে। অবশ্য এখানকার শব্দচয়ন কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছুটা আলাপ হয়েছে; তবে এর জন্য আলাদা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি। শব্দ নিয়ে খেলার করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। যাইহোক, প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে একজন মুসলিম চিন্তকের চিন্তা করার উচিত? এ প্রশ্ন তোলার আগে □চিন্তা□ কী□ এ প্রশ্নের সুরাহা করতে হবে। তাহলে চিন্তা কী? দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ অর্থে □চিন্তা□ বলতে বোঝায়□ তথ্য জোগাড় করা। কিন্তু, এটা চিন্তার সংজ্ঞা নয়। চিন্তা মানে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা নয়, কিংবা প্রত্যয়সমূহের এর মাঝে অথবা বস্তু ও প্রত্যয়ের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয়ের বিষয়ও নয়। বরং চিন্তা এর চেয়েও আরো বেশি কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তথ্য জোগাড় করবার মধ্যে চিন্তার একটি উপাদান বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে □তথ্য□ ও □জ্ঞান□ নিয়ে আমরা বড় একটি বিভ্রান্তিতে পড়ি। আমরা মনে করি, আমরা তথ্যের যুগে বাস করছি এবং তথ্য বিপ্লবের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে গিয়েছি। ফলে আমরা তথ্যের সাথে জ্ঞান, প্রজ্ঞা কিংবা চিন্তাকে অনেকসময় একীভূত করে ফেলি। অথচ তথ্য আর জ্ঞান এক জিনিস নয়। বরং তথ্য হচ্ছে নিছক ঘটনা (Fact), সংখ্যা বা উপাত্তের কাঁচামাল। এগুলো তখনি জ্ঞানে পরিণত হয় যখন তথ্যসমূহ পরস্পর মিলিত ও সম্পর্কিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হয়। তারপরেও জ্ঞানের এমন সংজ্ঞায়ন করাটা চিন্তা কী তা বুঝতে যথেষ্ট হবে না। বরং আমাদেরকে জ্ঞানের এ স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে এমন জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান করতে হবে, ইসলামি সিলসিলায় যা প্রজ্ঞা বা □হিকমাহ□ নামে অভিহিত। □হিকমাহ□ কী□ এ বিষয়ে আমি কিছুক্ষণ পরে কথা বলব।

চিন্তা বলতে নিঃসন্দেহে আমার মনোজগতের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়াকে বোঝায় না। দেকার্তের সময় থেকে পাশ্চাত্য দর্শনের একটা বড় অংশ যে পাটাতনের উপর নিজেদেরকে দাঁড় করিয়েছিল তা Subjectivism নামে পরিচিত। যেখানে জ্ঞান কী সেটা জ্ঞানকর্তা (knowing Subject) হিসেবে আমরাই ঠিক করে দিই। জগতের অর্থও জ্ঞানের কর্তাই আরোপ করে। আমরা টের পাই বা না পাই, মুসলিমরা-সহ আমরা সবাই সচারচর এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছি। আমরা এই ধারণা করে চলি যে, জগত হচ্ছে এমনকিছু যার কোনো অর্থ, তাৎপর্য, বুদ্ধিমত্তা নেই; এবং আমরা জ্ঞানের কর্তারাই অর্থ অথবা অর্থের বৈশিষ্ট্যসমুহ (properties) আরোপ করি বা ঠিক করে দিই। সুতরাং এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি সকল ধরনের চিন্তা, দর্শনকে আমার নিজের মনোজগতের এর অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ার বিষয় বানিয়ে ফেলে। তাই জগতকে আমি যেভাবে দেখি, সংজ্ঞায়ন করি কিংবা চিত্রায়ন করি জগত হচ্ছে তা-ই। সুতরাং যাকে আমি বাস্তবতা (Reality) বলে সংজ্ঞায়ন করি সেটাই বাস্তবতা হয়ে যায়। এটা হচ্ছে Subjectivism এর চূড়ান্ত পর্যায়। আর আমরা এখনো Subjectivist চিন্তার অবশেষ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। Subjectivism এর কথা অনুযায়ী যদি চিন্তা স্রেফ মনোঃজগতের এর অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ার চেয়ে বেশি কিছু না হয়, তাহলে আমরা কখনো আমাদের মন হতে বের হতে পারব না এবং আত্মজ্ঞানবাদ (Solipsism) এর সমস্যায় পড়ব। আমি কিভাবে জানি যে, আমার Mind এর মাঝে যা ধারণা (Concept) বা বিমূর্ত ভাবনা (Abstract Notion) আকারে আছে তা বহির্জগতের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত? অথবা আমি কিভাবে জানি যেটাকে আমি কলম বলি আসলে সেটা কলম, সেটা আমার কল্পিত কোন বিষয় নয়? ফলে আমি কখনোই আমার মনোজগতের বিষয়ের সাথে বাস্তব জগতের বিষয়ের সংযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব না।

ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা কখনো এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়নি। কেননা এ সিলসিলাটি এ অনুমানের সাথে শুরু হয় যে, অস্তিত্ব জগত (The World of Existence) তার সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থপূর্ণতার সাথে বিরাজমান। আমার জানার আগেই কিংবা বহিঃজগতের সাথে বৌদ্ধিকভাবে আমার মিথষ্ক্রিয়া শুরু হবার পূর্বেই (এখানে Phenomenology র পরিভাষাঃ Intentionality ব্যবহার করা যেতে পারে) জগত তার নিজস্ব অর্থ ও গুরুত্ব নিয়েই হাজির থাকে। সুতরাং আমার অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, আমি জগত নিয়ে চিন্তা করি বা না করি, জগত ঠিকই আমার থেকে স্বাধীন হয়ে টিকে আছে। শুধু এটাই নয় যে জগত আমার কল্পনার বাইরে স্বাধীনভাবে টিকে আছে; বরং তেমনভাবে জগতের নিজস্ব অর্থও আছে আছে, যা একজন জ্ঞানকর্তা হওয়ার কারণে আমার উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ, আমি বস্তুর বাস্তবতা (Reality of Things) সম্পর্কে জানতে পারি, বস্তুর অর্থ আমি আবিষ্কার করতে পারি, কিন্তু বস্তুর অর্থ আমি তৈরি করি না। এই অর্থে সকল চিন্তা হচ্ছে Ontology এবং অস্তিত্ব নিয়ে বোঝাপড়া করা। কেননা আমি মনে করি সকল ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে হোক সেটা দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, কিংবা শিল্প বিষয়ক, সেটা কোনো বিষয় নয় মৌলিক প্রশ্নটি হচ্ছে কেন বাস্তবে অনস্তিত্ব না থেকে বরং অস্তিত্ব থাকে। আপনারা কি কখনো এ নিয়ে ভেবে দেখেছেন যে কেন বাস্তবতা কোনোকিছু নাই এটা না হয়ে বরং কোনোকিছু আছে এমন হল? কেন আমরা অস্তিত্বশীল থাকি? কেন এই জগতের অস্তিত্ব আছে বা কেন অস্তিত্বশীল জগতের অস্তিত্ব আছে? এটাই হচ্ছে আদি ও মৌলিক প্রশ্ন, যা সকল গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাকে মোকাবেলা করতে হয় বা এর উত্তর খুঁজে বের করতে হয়। সুতরাং এটা আমাদের সামনে অস্তিত্ব নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন হাজির করে অস্তিত্ব কী? (মুসলিম দার্শনিকদের কাছে যা ওজুদ নামে পরিচিত।) অস্তিত্ব (ওজুদ) ও অস্তিত্বশীল (মাওজুদ) এর মাঝে সম্পর্ক কী? অথবা এদের মাঝে পার্থক্য-ই বা কী? অস্তিত্ব (ওজুদ) কি অস্তিত্বশীলের (মাওজুদের) সমষ্টি? না কি যা-কিছু অস্তিত্বশীল আছে, অস্তিত্ব তার চেয়ে বেশি কিছুকে বুঝায়? আল ফারাবি, ইবনে সিনা, ইবনে আরাবি থেকে মোল্লা সদরা পর্যন্ত সকল মুসলিম দার্শনিকরা এই প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ জওয়াব দিয়ে গেছেন। কিন্তু, আমরা তাদের সম্পর্কে কতটুকু জানি সেটাই গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

সুতরাং আজকের প্রোগ্রামের শিরোনামটিকে (Muslim Future Thinkers Forum) আমাকে বন্ধনীর মধ্যে রাখতে হবে। আগেই বলেছি, আমি শব্দ নিয়ে খেলা করতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হয় আজকের সভার শিরোনামটি গুরুত্বপূর্ণ, যা আমাদেরকে সত্যিই ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে। এটা চমৎকার! আসলে আমাদের কোনো বিষয় সম্পর্কে খোলা মন এবং ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি। কিন্তু আপনারা জানেন, একমাত্র আল্লাহ-ই ভবিষৎ সম্পর্কে জানেন, যেমনটা প্রফেসর মেহমুত ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং আমরাও সেটাকে সত্য বলে মানি। এর মানে কি ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের চিন্তা বন্ধ করে দেয়া উচিত? না, তা নয়। একমাত্র আল্লাহ তা়য়ালা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানেন, তবুও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যৎ কেমন হওয়া উচিত, কিরূপ হতে পারে, কিংবা একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার জন্য আমরা কী কী অবদান রাখতে পারি। কিন্তু আমি মনে করি তার আগে আমাদেরকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে, আমরা কি আমাদের খোদ বর্তমান সম্পর্কে কিছু জানি? এবং আরো গুরুত্বের সাথে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে, আমরা আমাদের অতীত সম্পর্কে কতটুকু জানি?

আমরা যেরকম চাই, আপনাদের যদি সেরূপ ভবিষ্যত নির্মাণ নিয়ে চিন্তা করতে হয়, তবে সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হল, আমরা আমাদের খোদ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কী জানি বা আপনারা কী জানেন? আমাদের নিজস্ব অতীত, ইতিহাস, সিলসিলা, সামষ্টিক স্মৃতি সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? আমি এটাকে রূপক (রেটোরিকাল) বা কুট তর্কের প্রশ্ন হিসেবে বলিনি, বরং এটা একটা

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপনারা যদি খেয়াল করেন তবে দেখতে পাবেন যে, আমাদের বর্তমান চিন্তাজগতে প্রভাব রাখার জন্য নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলাকে হাজির করার ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের বর্তমান দৃশ্যপট তেমন উজ্জ্বল নয়। ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আমরা এখনো ক্রিটিকাল এডিশন আকারে প্রকাশ করতে পারিনি। আল ফারাবি, ইবনে সিনা, আল কিন্দি এদের মতো প্রসিদ্ধ নামকরা দার্শনিকদের কাজগুলো এখনো গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য ক্রিটিক্যাল এডিশন-সহকারে প্রকাশ হয়নি; এমনকি এদেরকে অন্য ভাষায় তর্জমা করার মতো কাজও যথাযথ পরিমাণে হয়নি। আরো শতশত পণ্ডিতদের তাহলে কী অবস্থা যাদের নিয়ে এখনো গবেষণা এবং আবিষ্কার করা বাকি আছে? এটা ঠিক যে, আমাদের পরিচিত বড় বড় চিন্তকদের কিছু কাজ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আমাদের জানাশোনা আছে। কিন্তু যদি আপনারা এর সাথে পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যের তুলনা করে দেখেন, উদাহরণস্বরূপ গ্রিক থেকে শুরু করে রোমান হেলেনিস্টিক আমল, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাকে তারা কিভাবে অধ্যয়ন করেছে! কোনো তুলনাই হয় না আসলে! প্লেটো, এরিস্টটল, অগাস্টিন, থমাস এ্যাকুইনাস, কান্ট, হেগেল-সহ পরবর্তীদের উপর হাজার হাজার গবেষণা করা হয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই এদের উপর ইতোমধ্যে হাজার হাজার গবেষণা হয়েছে। আর এ হিসাবটা যখন আমাদের নিজস্ব পাণ্ডিত্যের বেলায় আসে, আমার মনে হয় সত্যিই আমাদের গবেষণা খুবই যৎসামান্য, ভীষণ অপর্যাপ্ত।

সুতরাং আমরা আমাদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্বপুরুষদের কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী হয়ে আছি। তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে তাঁরা সংস্কৃতি, সভ্যতা, বিজ্ঞান, শিল্পচিন্তার যে বুনিয়াদ তৈরি করে গেছেন তা বোঝার চেষ্টা করা। তবে আমাদের মতন ভাসাভাসা স্তরের চিন্তা তাঁরা করেননি। বিষয়টি কত সংখ্যক বই লেখা হয়েছে তার প্রশ্ন নয়। বরং প্রশ্ন মান ও গভীরতার; চিন্তার জন্ম দেয়ার। কেননা প্রগাঢ় চিন্তা ছাড়া কোনো সংস্কৃতি এবং সভ্যতার জন্ম হয় না। আমি যদি সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে চাই, তাহলে বলব সভ্যতা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিকে (Worldview) বাস্তবায়ন করা এবং মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে অস্তিত্বের জগতকে উপলব্ধি করা, এবং সেই সাথে অধিবিদ্যাগত (metaphysics) অবস্থার সাথে সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক তৈরি করা। তার মানে হচ্ছে সেসব অধিবিদ্যাগত নীতিসমুহ (metaphysical principle) সম্পর্কে শুরুতেই আপনাদের যথাযথ বোঝাপড়া থাকতে হবে। কারণ এ নীতিগুলোই সমাজ, সংস্কৃতি, নগর, শিল্প, নন্দনতত্ত্বের বিকাশ ঘটায়। সুতরাং আপনাদেরকে এসব অধিবিদ্যাগত নীতিসমুহ দিয়ে বোঝাপড়া আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আমি জানি আমরা এখন যে যুগে বাস করছি, এখানে এ বিষয়গুলো তেমন পরিচিত নয়। কারণ আজকাল আমরা আর চিন্তা করি না; কেবল তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করি। আমরা মনে করি যে আমরা চিন্তা করছি; আসলে চিন্তা করছি না, বরং আমরা সোজাসাপ্টা তথ্যকে প্রক্রিয়াভূক্ত করছি। এমনকি বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মারফতে আমাদের মনযোগের পরিসর ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। যোগাযোগমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে অর্থাৎ তথ্যকে গিলে ফেলার মাধ্যমে আমরা মনে করি আমরা চিন্তা করছি। মোটেও না, আমরা চিন্তা করছি না; বরং সোজাসাপটা তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করছি। আমরা তথ্য সংগ্রহ এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ নামক এই ভাসাভাসা স্তরের বাইরে যেতে পারছি না।

আমরা এখনো চিন্তা করছি না। তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তাকে বিমূর্ত, অপ্রাসঙ্গিক, অজনপ্রিয় ও অলাভজনক হিসেবে দেখা হয়। কেননা এটা কোনো তাৎক্ষণিক ফলাফল ঘটায় না, কোনো খবরের শিরোনামে আসে না, কিংবা অনেক জনপ্রিয়ও হয় না। তাই যদি হয়, তাহলে আপনাদের পড়াশোনা করার দরকারটা-ই বা কী? আমি বুঝাচ্ছি যে, কয়েকটা টুইট করে যদি আপনি সামাজিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হতে পারেন, যখন আপনার এ ধরনের মোহিনীশক্তিই থাকে; তখন নিগূঢ় চিন্তা করার কী এমন দরকার পড়ে! আমরা বর্তমানে এ ধরনের মনস্তত্ত্ব এবং পরিবেশের মধ্যে বাস করছি। আর সে কারণেই আমাদের নিজেদেরকে বোঝার জন্য, অস্তিত্বের জগতকে বোঝার জন্য এবং আমরা যে বাস্তবতায় বাস করছি তার সাথে অস্তিত্বের জগতের যে সম্পর্ক আছে তা বোঝার জন্য আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তা করার প্রয়োজন আছে; যাতে করে আমরা যথার্থভাবে জানতে পারি আমাদের সিলসিলা কী? আমাদের বর্তমান অবস্থা আমাদেরকে কী পয়গাম দেয়? এবং আমাদের ভবিষ্যত কেমন হওয়া উচিত? তাই এই তো কয়েক মিনিট আগে আপনাদের উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলাম সে প্রশ্নে আবার ফিরে আসতে চাই। সকল তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তার শুরু হয় এ প্রশ্নটি দিয়ে যে, কেন বাস্তব কোনোকিছু নাই এমন না হয়ে বরং কোনোকিছু আছে এমন হল? বস্তু কি তার নিজ প্রকৃতির চেয়ে ভিন্ন কিছু হতে পারত? একটি পুরো ভিন্ন জগত ব্যবস্থার কথা চিন্তা করুন, উদাহরণস্বরূপ যেখানে আমাদের মতো মানুষদের দুই পা না থেকে বরং তিন পা থাকে; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো এমনটা নয়, তাইতো? কারণ আমাদের দু হাত আছে, দুই পা আছে। কিন্তু সেটা কেন? সবকিছু কি পরিবর্তন হতে পারত? সবকিছু একেবারে ভিন্নরকম হতে পারত? কে বস্তুকে তার স্ব-প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন? এবং আমি তাহলে কি করতে পারি? একজন মানুষ এবং কর্তাসত্তা হিসেবে আমাকে পয়লা বুঝতে হবে কেন বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি আছে; এর মাধ্যমে যাতে বস্তুজগতের জন্য কল্যাণজনক কিছু করতে পারি। ভিটগেনস্টাইন তার প্রথম দিকের Tractatus Logico-Philosophicus বইয়ে Logical Atomism and Positivism এর কথা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তা পরিত্যাগ করেন এবং তার ধারাবাহিকতায় ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশন বইয়ে যখন Family Resemblance এর ধারণা নিয়ে আলাপ

তুলেছিলেন, তখন সেখানে তিনি একবার বলছিলেন, আমি জগতকে আমার নিজের মন অনুযায়ী না বুঝে জগতকে তার মতো করে বোঝার চেষ্টা করছি।

তিনি বলেন বস্তু একেবারে ভিন্নরকম হতে পারত। কোন অর্থে তিনি এটা বলেছেন সেটা বলা কঠিন; কিন্তু তিনি বলেছেন যে, বস্তুগুলো অনেক ভিন্নরকম হতে পারত। হয়ত তিনি এটাকে একবারে সাধারণ অর্থে বুঝিয়েছিলেন। সম্ভবত এর মানে হচ্ছে, ভাষার কায়দা-কানুন একবারে ভিন্নরকম হতে পারত, ভাষার বাক্যরীতি একবারে ভিন্নরকম হতে পারত; কিংবা হয়ত তিনি বুঝিয়েছিলেন, উদাহরণস্বরূপ□ তিনি একজন গরীব দার্শনিকের চেয়ে একজন ধনী ব্যবসায়ী হতে পারতেন। সম্ভবত তিনি এটাকে ভিন্ন পারিভাষিক অর্থে বুঝিয়েছিলেন যেটা আমরা জানি না। কিন্তু তিনি তার দিনলিপি অথবা দর্শন বিষয়ক নোটপত্রে এতটুকুই লিখে রেখেছিলেন যে, বস্তু অনেক ভিন্নরকম হতে পারত। যখন আমি এটা পড়লাম তৎক্ষণাৎ □Contingency□ ধারনাটা আমার মাথায় আসল, ইসলামি দর্শনে যা □মুমকিনুল ওজুদ□ নামে পরিচিত।

আমি বলেছিলাম, এ ধারণাটাই তিনি ধরার চেষ্টা করছিলেন। খেয়াল করেন ইবনে সিনা কী বলেছিলেন; প্রসঙ্গক্রমে তা তিনি আল ফারাবি থেকে নিয়েছিলেন। কেননা আপনারা ইবনে সিনার মাঝে যা দেখেন, তার অধিকাংশ চিন্তা আসলে আল ফারাবি থেকে এসেছে। তবে ইবনে সিনা অনেক প্রতিভাবান ছিলেন; কারণ তিনি সকল চিন্তাকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন এবং সেগুলোকে আরো সূক্ষ্ম, নিগুঢ়ভাবে প্রকাশ ছিলেন; এবং আপনারা জানেন □অস্তিত্ব□কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে□ □অত্যাবশ্যকীয় সত্তা□ (ওয়াজিবুল উজুদ) অর্থাৎ যা ছাড়া কোনোকিছুই অস্তিত্বশীল হতে পারে না। আর অত্যাবশ্যকীয় সত্তা সয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্বও বটে, অর্থাৎ যা নিজেই অস্তিত্বশীল; মানে যার অস্তিত্বের জন্য অন্য অস্তিত্ব অথবা উৎপত্তিস্থলের প্রয়োজন পড়ে না। এমন অস্তিত্ব, এমন সত্তা এবং এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা কেবল একটিই হতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে□ □মুমকিনুল ওজুদ□; □অনিশ্চিত সত্তা□ বা সম্ভাব্য সত্তা। অর্থাৎ যা অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের মাঝে ঝুলে থাকে; যা অস্তিত্বশীল আছে কিন্তু অস্তিত্বশীল না থাকার সম্ভাবনাও আছে। এভাবে ইবনে সিনা অনিশ্চিত সত্তা বা মুমকিনুল ওজুদ নামে এ অসাধারণ চিন্তাটি হাজির করলেন। আপনারা এ নিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন, আমি এবং আপনারা□ যারাই এ সেমিনার রুমে এখন অবস্থান করছি, সবাই অনিশ্চিত সত্তা। আমরা এখন অস্তিত্বশীল আছি; কিন্ত আমরা অস্তিত্বশীল নাও থাকতে পারি। কাজেই আমাদের খোদ অস্তিত্বের নিশ্চয়তা কে দেয়? আগামীকাল হয়ত আমার অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। আমি জানি না, এটাই হয়ত আমার শেষ বক্তব্য হতে পারে।

সুতরাং এটা আমাকে চিন্তার খোরাক দেয় যে, আমরা অনেক ভিন্ন হতে পারতাম; দুনিয়ার অন্য প্রান্তে থাকতে পারতাম কিংবা আমরা ভিন্ন কিছু করতে বা হতে পারতাম। এ সবকিছুই মুমকিনুল ওজুদ ধারণার মধ্যে আছে। আচ্ছা, যখন আপনারা এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আপনাদের যদি এক নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হয়, যে ভবিষৎ বর্তমান অবস্থা থেকে ভিন্ন□ সে বর্তমান অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য আমার অনেক কথা বলা লাগতে পারে। কিন্তু আমাদের সব কথা বা চিন্তার ভিত্তি হবে মুমকিনুল ওজুদ। তো, সে ভবিষ্যৎ নির্মাণের কায়দাকানুন এবং সে জন্য আমার চিন্তনপ্রক্রিয়াটা কেমন হতে পারে? আমার নিজের সিলসিলায় আমার যে মজবুতি বুনিয়াদ প্রোথিত আছে তার সাহায্যে আমাকে সে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

তারপর ইবনে সিনা তাঁর তৃতীয় ধারণা□ □মুমতানিউল ওজুদ□ বা □অসম্ভাব্য অস্তিত্বে□র কথা উপস্থাপন করলেন। আপনারা এটা ভালো করে জানেন যে, (২+২) কখনো পাঁচ হতে পারে না। কিংবা একটি বর্গাকৃতির বৃত্তের অস্তিত্ব থাকতে পারে না; এবং এই ধরণের অন্যান্য যেসব অসম্ভব বিষয় আছে। এরপরে তিনি (ইবনে সিনা) যুক্তিবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিলেন। আপনারা জানেন যে, এগুলো হচ্ছে অস্তিত্বের মৌলিক প্রতিজ্ঞা (Mode of Existence); এবং এ তিনটির বাইরে চতুর্থ কোনো প্রতিজ্ঞা হতে পারে না। ভাবেন, কিন্ত সেটা কেন? হতে পারে ইবনে সিনার এ ব্যাপারে চিন্তার ঘাটতি ছিল। কিন্তু, আপনারা চেষ্টা করতে পারেন। এটি একটি ভালো চ্যালেঞ্জ। আমিও প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, কিন্ত, চতুর্থ প্রতিজ্ঞার নাগাল এখনো পাইনি। তবে নিঃসন্দেহে আপনারা চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু মূল বিষয়টি হচ্ছে, সকল চিন্তা □অস্তিত্ব□ এবং □অনস্তিত্বে□র নানান ধরণ (modalities) এর বোঝাপড়ার কাছে ফিরে আসে। উদাহরণস্বরূপ যখনই আমি বলি, এটি একটি কলম এবং একটি কক্ষে আমি এখন এই বক্তব্য দিচ্ছি; তখন আমি অস্তিত্বের কথা বুঝাচ্ছি, কলম নামক বস্তুকে নির্দেশ করছি; একটি স্থানের কথা বুঝাচ্ছি, যখন ইস্তাম্বুলের ইবনে খালদুন ইউনিভার্সিটিতে আমরা সকলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান করছি ইত্যাদি কিছু। কিন্ত এই সকল বস্তু স্রেফ কোনো বস্তু নয়; বরং অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ এবং অস্তিত্বের বিভিন্ন ধরণ। বিষয়টা এমন নয় যে, এই সকল বস্তু অস্তিত্বকে গঠন করে। বরং অস্তিত্ব নিজেকে বিভিন্ন আঙিকে (mode), বিভিন্ন রঙে প্রকাশ করে। এটাকেই মুসলিম দার্শনিকরা □আনহাইয়ুল ওজুদ□ (Modalities of Existence) নামে অভিহিত করেছেন। মোল্লা সদরা এ নিয়ে অনেক লেখাজোখা করেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পুনরায় ইবনে সিনার; তবে বেশীরভাগ ইবনুল আরাবির চিন্তাকে যোগসূত্র করে এই গোটা বিষয় সম্পর্কিত চিন্তাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন, অস্তিত্ব মানে অস্তিত্বশীলের সামগ্রিকতা বা সমষ্টি নয়; বরং অস্তিত্ব অস্তিত্বশীলের চেয়েও বেশি কিছু। কিন্তু সেটা কেন? উদাহরণস্বরূপ□ যখন আপনারা কোনো □বই□য়ের কথা চিন্তা করেন; আচ্ছা□ □বই□ কী? □বই□ কি এর

মলাট, পৃষ্ঠাসংখ্যা, রঙ, কালি এসব-সহ আরো অনান্য ভৌত গুণের সমষ্টি? আসলে এ সকল কিছু হচ্ছে বইয়ের ভৌত সম্পত্তি; কিন্তু খোদ □বই□ নয়। বরং □বই□ এ সকল ভৌত বৈশিষ্ট্যের (physical properties) সমষ্টির চেয়েও বেশি কিছুকে বোঝায়। □বই□ হচ্ছে□ যা আপনারা পড়েন। বই হচ্ছে□ যা থেকে আপনারা কিছু শিখেন। একই বইটি আরো ছোট ফন্টে মুদ্রণ করা যেতে পারে, যেন বইয়ের কলেবর দেড়শত পৃষ্ঠায় চলে আসে; কিংবা বইটি ছবি সহকারে অথবা ছবি বাদে আরো বড় ফন্টে মুদ্রণ করলে দুইশ পৃষ্ঠায় চলে আসবে। কিন্তু এসব পরিবর্তনের কারণে বই তার □বই□ হওয়ার কিংবা জ্ঞান বা তথ্যের উৎস হওয়ার গুনাগুণ হারিয়ে ফেলে না। ভৌত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় ঠিক; কিন্তু ভৌত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কারণে বইয়ের মূল পরিচয় হারিয়ে যায় না। আচ্ছা, আপনারা এখন যে চেয়ারটিতে বসে আছেন; চিন্তা করতে পারেন□ নানান কিসিমের, নানান রঙয়ের, নানান আকারের, নানান পায়ের এবং নানান আরামদায়ক রকমের কত হাজার হাজার চেয়ার আছে। সবগুলোই কিন্তু চেয়ার। তাহলে চেয়ার কী? মুসলিম দার্শনিকরা বলেছেন চেয়ারের সত্তা (Essence বা Quiddity) হচ্ছে চেয়ারের সংজ্ঞা। চেয়ারের আকার-রূপ পরিবর্তন হতে পারে, অনেক বিভিন্ন গড়নে চেয়ারের আকৃতি আসতে পারে।

সুতরাং মূল কথা হচ্ছে তারা এ চিন্তাকে অস্তিত্বের বাকিদের উপরে প্রয়োগ করেছেন। আপনাদের সামনে কত অজস্র ধরণের বস্তু আছে□ যা নানা রূপে, নানা রঙে এবং নানা আকারে প্রকাশিত হয়। আর এসব কিছুকে অস্তিত্বের বাস্তবতা (Reality of Existence) ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। বিষয়টা এমন নয় যে আমরা যাকে অস্তিত্ব বলি, তাকে এ সকল বস্তু তৈরি করে। বরং অস্তিত্বই নিজেকে বিভিন্ন আকার এবং আকৃতিতে প্রকাশ করে বা প্রকাশিত হয়। আর প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তা হচ্ছে অস্তিত্বের এসব বিভিন্ন ধরণ (Modalities) নিয়ে বোঝাপড়ার চর্চা করা। যখন আমরা এ ধারণাটা মেনে নিই যে, পয়লা আমাদেরকে আমাদের মনের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ার প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করতে হবে এবং খোদ অস্তিত্বে গিয়ে হাজির হতে হবে; তখন আমি আর নিজেকে চূড়ান্ত সত্তার (Being) মতো সেমি-গড হওয়ার ভান ধরতে পারি না যে জগতকে অনেক উপর থেকে দেখে; অথবা থমাস নেগালের Position of Nowhere থেকে আমি জগতকে দেখতে পারি না। আধুনিকতার দম্ভ-অহমিকা এটাই যে□ [সে মনে করে] □আমি জগতকে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে দেখতে পারি, যেভাবে খোদা জগতকে দেখেন। কারণ আমি জগতের অর্থ ঠিক করে দিই। আমিই জগতের অর্থ প্রদান করি। কারণ জগতের কোনো অর্থ নাই□। ১৯৩০ এবং ১৯৪০ দশকের দিকে লজিকাল পজিটিভিস্টরা বিজ্ঞানবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে এ বিষয়টিই বলেন যে, জগতের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। জগত হচ্ছে নিছক বস্তু। আর বস্তু মানেই আঁধার এবং বস্তু মানেই এর কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। কাজেই আমিই বস্তুর অর্থ ঠিক করে দেই। সুতরাং আধুনিকতা কয়েক শতাব্দী ধরে আলোকায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) চিন্তার মধ্য দিয়ে যাওয়ায়, তা ব্যক্তি মানুষকে সেমি-গডে পরিণত করেছে যে, সে মনে করে□ □আমি হচ্ছি মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু□। এখানে স্ববিরোধিতার যে ব্যাপারটি ঘটেছে তা হল□ জগতকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেওয়ার কারণে আধুনিক বিজ্ঞান মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান থিওলজিকে সমালোচনা করেছিল; অথচ আলোকায়ন চিন্তা সেই জায়গায় কর্তাসত্তা হিসেবে মানুষকে স্থলাভিষিক্ত করল। মানুষ হয়ে উঠল মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা শুধুমাত্র জগতের নয়, পুরো অস্তিত্বের এবং নক্ষত্রপুঞ্জসহ তামাম মহাবিশ্বের কোনো অর্থ নেই; বরং আমিই (মানুষ) এর অর্থ আরোপ করি। এটাই হচ্ছে আধুনিকতার দম্ভ। ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলায় আমাদের কখনো এ সমস্যাটা ছিল না। কারণ হচ্ছে যে মূলনীতির কথাটা আমি আগে বলেছিলাম□ ইসলামি চিন্তা অনুযায়ী যে মুহূর্তে অস্তিত্বের জগত অস্তিত্ববান বা সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়, তখন তা অর্থ সাথে করেই নিয়ে আসে। আমি মনে করি কোরআনে এটা স্পষ্টভাবে বলা আছে। কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়; □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□, □হে আমার প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি□ (সুরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৯১)। তাছাড়া আপনারা জানেন, অন্যান্য আয়াতে আকাশ এবং জমিনের কথা বলা হয়েছে; আর এ সবকিছু আল্লাহ মানুষের সেবার জন্য তৈরি করেছেন। তারপর তিনি মহাবিশ্বকে সুবিন্যস্ততা (মিযান) দান করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ প্রার্থনাটি করতে বললেন এবং আল্লাহ নিজের কাছে নিজে প্রার্থনা করছেন না, বরং তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলছেন। তার মানে হচ্ছে এ সবকিছুর নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে; সেটা আমি বুঝতে পারি বা না পারি। বিষয়টি যদি তা-ই হয়, তাহলে চিন্তন-প্রক্রিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জড়িয়ে আছে। একদিকে আমি অবশ্যই □বস্তু□ এবং □ধারণা□র মাঝে সম্পর্ক তৈরি করি, সেই সাথে ধারণা বা প্রত্যয়সমূহ পরস্পর সম্পর্ক তৈরি করে তাদের মাঝে। এটা চিন্তন-প্রক্রিয়ার একটি দিক। একইসাথে বস্তুর প্রকৃতির মাঝে যে সহজাত অর্থ আছে তা আমি আবিষ্কার করি এবং প্রকাশ করি। তাহলে Generic Terms অনুযায়ী, আমরা প্রথম দিকটিকে বলতে পারি □ইনশা□; অর্থাৎ আমি নিজে অর্থ তৈরি করি। আর দ্বিতীয় দিকটিকে বলতে পারি □কাশফ□। সুতরাং □ইনশা□ হচ্ছে□ আমি জ্ঞান এবং তথ্য তৈরি করি, পাশাপাশি আমি বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞান জমায়েত করি। আমি যে নতুন কিছু তৈরি করছি, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু জ্ঞান নির্মাণের এ প্রক্রিয়া আমাকে জগতের একমাত্র মালিক বা ব্যাখ্যাকার বানিয়ে দেয় না। তবে অবশ্যই আমি আমার নিজের অবদান রাখছি।

তারপর দ্বিতীয় উপাদানটি হচ্ছে □কাশফ□□ মানে উন্মোচন করা, আবিষ্কার করা, পর্দা সরিয়ে নেওয়া। যাতে করে খোদ সত্য প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং চিন্তার দ্বিতীয় বোঝাপড়া বা দিকটি হচ্ছে□ আমার কাজ হল□ আমি বস্তুকে তাদের মতো হতে দিব,

আমি তাতে হস্তক্ষেপ করব না এবং তাদের অস্তিত্বের অবস্থার উপর সীমালঙ্ঘন করবো না; বরং আমি তাদেরকে তাদের মতো হতে দিব যাতে করে তারা নিজেরাই নিজেদের বাস্তবতাকে জাহির করতে পারে। অবশ্য তার জন্য আমাকে অস্তিত্বের বাস্তবতায় হাজির হতে হবে। আমাকে এ বিষয়টা গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। আমি জগতের প্রভু টাইপের আচরণ করতে পারি না। জগতের সাথে আমাকে আমার বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ করতে হবে এবং আমাকে জগতের জিম্মাদার হতে হবে। যে কারণে আধুনিক জমানায় পরিবেশ সংকট উদ্ভূত হয়েছে, তা হচ্ছে আমাদেরকে আমানত হিসেবে দেয়া জগত-এর সঙ্গে আমরা বিশ্বাসের সাথে দেখভাল করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বরং জগতকে আমাদের মালিকানাধীন কিছু হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ফলে আমরা ধরে নিয়েছি যে জগতের সাথে আমরা যেকোনো কিছু করতে পারি; কিংবা জগতের কাছ থেকে যে কোনোকিছু আবদার করতে পারি। কিন্তু ঘটনাতো এমন হওয়ার কথা ছিল না। এর পরিণতি আমরা বর্তমান দুনিয়ায় দেখতে পাচ্ছি।

সুতরাং আমি যখন কাশফের কথা বলছি তখন আমি সাধারণত পরিভাষাটির মরমি অর্থে বুঝাচ্ছি না; যদিও পরিভাষাটি এমন বুঝাতে পারে। কাশফ হচ্ছে পর্দা উন্মোচন করার মতো; এবং আমার অধ্যাপক সাইয়্যেদ হুসেইন নাসর একবার আমাকে একটি ঘটনা বলেছিলেন। (আল্লাহ উনাকে দীর্ঘ এবং সুস্থ হায়াত দান করুন।) ঘটনাটি হচ্ছে, তখন হেনরি করবিন ইরানে পড়াচ্ছিলেন; এবং সেটা ছিলো বিপ্লবের আগে ১৯৭০ দশকের দিকে। একদিন খুব সম্ভবত আল্লামা তাবাতাবায়ি করবিনের কাছে জানতে চাইলেন, Phenomenology-কে কিভাবে তিনি ইসলামি পরিভাষায় তর্জমা করবেন। কারণ তিনি ফেনোমেনোলজি নিয়ে কথা বলছিলেন এবং তিনি এ বিষয়ে হুসার্ল, হাইডেগারসহ অন্যান্যদের লেখালেখিগুলো পড়াচ্ছিলেন; তাই তিনি এ কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটি করলেন। (কেননা ফেনোমেনোলজিকে আমি আমার নিজের ভাষায় বুঝতে চাই।) তাহলে ফেনোমেনোলজিকে আপনি কিভাবে আরবি, ফার্সি বা তার্কিশে তরজমা করবেন? আপনারা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কখনো কি এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন? আপনারা তো ফেনোমেনোলজি সম্পর্কে জানেন, তাই না? ফেনোমেনোলজি হচ্ছে দর্শনের একটি শাখা যা দাবি করে বা এর লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুকে তাদের নিজের মতো হতে দেয়া, নিজের মতো করে কথা বলতে দেয়া; কর্তাসত্তা (knowing Subject) এবং খোদ বস্তুর মাঝখানের দেয়াল/প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দিন, যাতে করে আপনি জানতে পারেন যে, সূর্য আপনা আপনি আলো দেয়, ফুল নিজে নিজে সুবাস ছড়ায়। আপনাকে কিছুই করতে হবে না, আপনি কেবল তাদেরকে তাদের মতো হতে দিন। তারপর হেনরি করবিন চমৎকার এক জওয়াব দিলেন। তিনি বললেন, আমি ফেনোমেনোলজিকে কাশফুল মাহযুব পরিভাষায় তর্জমা করব। কাশফুল মাহযুব অর্থ হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেওয়া। অবশ্য এটা তাসাওউফ নিয়ে কালাবাজির একটি বইয়ের নামও বটে [আসলে তাসাওউফ নিয়ে আবু বকর আল কালাবাজির লিখিত বইয়ের নাম কিতাব আত তাআররুফ এবং কাশফুল মাহজুব লিখেছেন আলী হুজওয়িরি সম্পাদক]। কাজেই এটা আমাদের সিলসালার একটি জনপ্রিয় পরিভাষা। বস্তুকে জানার জন্য বস্তুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাশফুল মাহযুবের মূল কাজ; উন্মোচন করা বা পর্দা সরিয়ে দেয়া। তার মানে হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই বস্তুকে গুরত্বপূর্ণ মনে করতে হবে; অর্থাৎ তাদের সাথে আপনাকে বিজড়িত হতে হবে। এবার তাহলে এ ধারণাকে সামাজিক পর্যায়ে এবং অন্যান্য সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করুন; দেখবেন আপনি তখন আর তাদেরকে অর্থহীন, গুরুত্বহীন, পরিচয়হীন এবং স্মৃতিশূন্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারবেন না। এটা প্রয়োগ করতে পারেন অন্যান্য মানব গোষ্ঠী, সমাজ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যারা আমাদের কাছে বিলকুল অপরিচিত ছিল, যাদের সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা ছিল না বললেই চলে।

অবশ্য বর্তমানে মোটামুটি সবকিছু সম্পর্কে আমরা কিছুটা হলেও জানি। কিন্তু একশত বছর আগে যদি চীনা সংস্কৃতি বা অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের কিংবা উত্তর আমেরিকার নেটিভ আমেরিকানদের সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হতো, আমরা তাদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না; তাদের ভাষা কী? সংস্কৃতি কী? কিংবা তাদের খাদ্যোভাস কী? সত্যি তখন আমরা আসলে তেমন কিছুই জানতাম না। কিন্তু এ মূলনীতি অনুযায়ী আপনাকে প্রথম ধরে নিতে হবে যে, তারা আমাদের সমপর্যায়ের; মানুষ হিসেবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সিলসিলা, অর্থের ব্যাপ্তি এবং সম্পর্কের প্রেক্ষাপট আছে। তাই আপনারা তাদের সাথে নৃশংস পশুর মতো আচরণ করতে পারেন না যেমনটা উনবিংশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপিয় উপনিবেশিকরা করেছিল। আমি আমার প্রকাশিতব্য বইয়ে এ বিষয় নিয়ে লিখেছি। এটা দেখতেও অনেক পীড়াদায়ক, যেভাবে উপনিবেশিকরা আধুনিক নৃবিজ্ঞান ও এথনোগ্রাফির ধারনা নিয়ে খেলা করেছিল। সেখানে তারা নির্মাণ করেছিল যাকে তারা মধ্য ইউরোপ এবং আমেরিকাতে নাম দিয়েছিল Human Zoo বা মনুষ্য চিড়িয়াখানা। আমার জানা নাই, আপনারা কখনো Human Zoo দেখেছেন কিনা। যখন চিড়িয়াখানার কথা বলা হয় তৎক্ষণাৎ আপনারা সাধারণত কোনো উদ্যানে থাকা পশুপাখির কথা চিন্তা করেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ব্রাসেলস, বার্লিন, লন্ডন, প্যারিসসহ ইউরোপের অধিকাংশ রাজধানীগুলোতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কতগুলো প্রদেশ ও শহরে তারা মনুষ্য চিড়িয়াখানা বানানো শুরু করল। সেখানে তারা আধুনিক সভ্য নামের তথাকথিত উন্নত ইউরোপবাসী এবং সভ্য শহুরেদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্য ফিলিপাইন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে তথাকথিত আদিম মানুষদেরকে ধরে নিয়ে আসতো। তারা কখনো তাদের সাথে মানুষের মতো আচরণ করেনি। তারা ছিল কৌতূহলের বস্তু; দেখ!

দেখ! তারা খায়! ওয়াও, দারুন তো! তারা দেখি আরেকজনের সাথে কথাও বলে! তার মানে হচ্ছে” তারা “পশ্চাৎপদ”, তারা “উন্নত” না। দেখেন, মজার ব্যাপার হচ্ছে এরাই আবার মানবতার বয়ান জাহির করে।

এ পুরো কাহিনীটি হচ্ছে ঊনিশ শতকের। আর আমি বলেছিলাম সর্বশেষ মনুষ্য চিড়িয়াখানাটি ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র ব্রাসেলসে ১৯৫৮ সালে তৈরি করা হয়েছিল বা খোলা হয়েছিল। কিন্তু এবার আমি আপনাদেরকে সাম্প্রতিক সময়ের একটি উদাহরণ দিব, যা এই কয়েক সপ্তাহ আগে ঘটেছিল। আমি তখন আমার প্রকাশিতব্য বইটি শেষ করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম এবং বইয়ের আখেরি কথাগুলো লেখছিলাম। আর একদিকে বই পাঠানোর জন্য প্রকাশক আমাকে তাড়া দিচ্ছিল। তখন আমি একদিন টেলিভিশনে খবর দেখলাম যে, বিজ্ঞানীরা ড্রোনের সাহায্যে আমাজন বনে একটি “আদিম” জনগোষ্ঠীর খোঁজ পেয়েছে; এবং আধুনিক “সভ্য” দুনিয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীটি থেকে ১৫ জন সদস্যকে তারা ধরতে পেরেছে। আমি শব্দগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করছি। কারণ আপনারা দেখেন ভাষাগুলো কেমন যেন! ““আদিম”, “আধুনিক দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন”। তারা অবশ্য “বর্বর” শব্দটি ব্যবহার করেনি। তবে আমি নিশ্চিত পঞ্চাশ বছর আগে হলে তারা “বর্বর” শব্দটিও ব্যবহার করত। কিন্তু তারা ঠিকই “আদিম, “অসভ্য মানুষ” এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করেছে। তারপর দেখানো হল যে, তারা হাঁটছিল এবং তাদের হাতে কিছু হাতিয়ার ছিল; আর বিজ্ঞানীরা ভাবল যে এগুলো তাদের অস্ত্র। আর প্রতিবেদনের শেষ কথাটি ছিল, “গতবছর স্বর্ণখনির শ্রমিকরা এই জনগোষ্ঠীটির দশজন মানুষকে হত্যা করেছিল”। আমি তখন বললাম, তাহলে এখানে কে সভ্য? আর কে আদিম? এ মানুষগুলো আমাজন বনের গহীনে বাস করত, তারা কারো ক্ষতিও করেনি কিংবা কাউকে হুমকিও দেয়নি; তারা তাদের মতো করে থাকত, হয়ত বর্তমানে তাদের বড়জোর কয়েকশত মানুষ বেঁচে আছে। আর আধুনিক মানুষরা কী করল? তারা ড্রোন নিয়ে আসল। চিন্তা করে দেখুন, আমি এখানে ফুটে ওঠা চিত্রকল্পের কথা বুঝাচ্ছি” যা সত্যিকারে অবিশ্বাস্য। আপনি ড্রোন নিয়ে আসলেন আর তাদেরকে উপর থেকে নজরদারি করতে লাগলেন। কারণ, তারা হচ্ছে “অনুন্নত প্রজাতির অস্তিত্ব” এবং “পশু প্রজাতির মানুষের মতো”; আপনি তাদেরকে উপর থেকে নজরদারি করার চেষ্টা করছেন। কেবল চিত্রকল্পের দিকে তাকান আর প্রতিবেদনের শেষ কথাটির কথা চিন্তা করুন যে, “গতবছর ঐ জনগোষ্ঠীর দশজন সদস্য স্বর্ণখনি শ্রমিকদের হাতে মারা গিয়েছে”। বেশ, যারা সে মানুষদেরকে পর্যবেক্ষণ করছিল খুব সম্ভবত তারাই হচ্ছে এখানে আদিম, অসভ্য এবং বর্বর। আর অন্যদিকে এ মানুষগুলো হচ্ছে সভ্য এবং অক্ষতিকর। অথচ আমরাই তাদেরকে হত্যা করছি; এবং আমি নিশ্চিত যে কয়েকদশকের মধ্যে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অথচ এভাবেই আমরা এ ধরণের চিন্তার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। আমি যে সংবাদ প্রতিবেদনের কথা বলছিলাম আপনারা তার সবকিছু CNN-এ দেখতে পারবেন।

সুতরাং, অস্তিত্বকে বুঝতে এবং অস্তিত্ব ও তত্ত্ববিদ্যার (Ontology) সম্পর্ক নিয়ে বোঝাপড়ার মতো গভীর চিন্তা করতে গেলে আমাকে “অস্তিত্ব”কে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। তার মানে হচ্ছে, তত্ত্ববিদ্যার (ontology) যথাযথ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে চিন্তা শুরু হয়। কারণ সঠিক তত্ত্ববিদ্যা বাদে সঠিক কোনো জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) হয় না। তত্ত্ববিদ্যা হচ্ছে দর্শনের একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। চিন্তাপ্রক্রিয়া কেবল অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিষয় নয়, বরং অনেকগুলো মানব সক্ষমতার (human faculty) ব্যবহারও চিন্তা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেবল “যুক্তি” এবং “ইন্দ্রিয়”ই আমার একমাত্র সক্ষমতা নয় যার মাধ্যমে আমার বস্তু জগতকে বোঝাপড়ার সুযোগ আছে। আমাকে অন্যান্য সক্ষমতাগুলোও কাজে লাগাতে হবে; কেননা সৃষ্টি জগত বা অস্তিত্বের জগত হচ্ছে পুরোপুরি অখণ্ড এবং পরস্পরনির্ভর। সুতরাং যে সরঞ্জামের মাধ্যমে আমি এই অখন্ড বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করবো তাকে অবশ্যই একই জটিলতাকে প্রতিফলিত করতে হবে। আমি যেটা বুঝতে চেষ্টা করছি, তার সাথে এটা মিলতে হবে। একটি অনেক জটিল বহু-রঙ বিশিষ্ট ছবির দিকে যদি আমি আমার চোখের একটিমাত্র রঙয়ের সাহায্যে একটি একক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাই, তাহলে আমি কখনো সে (ছবির) জটিলতাকে বুঝতে পারব না। আমি তাহলে এটাকে খুবই সাদামাটা ও সীমিত পরিসরে নিয়ে আসব; এবং সেটা কখনো তাকে সার্বিক বাস্তবতা আকারে হাজির করতে পারব না। সুতরাং আমাকে অনেক সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ যুক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের বাইরে গিয়ে আমাকে হৃদয়, শৈল্পিক চিন্তা, অনুভূতি, সচেতনতা এবং সেই সাথে আমাকে বোঝাপড়ার সক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে; যাতে করে আমি এ ধরনের বিশিষ্টকরণ/সরলীকরণ (Reductionism) এড়াতে পারি। হৃদয়, মন, যুক্তি, বুদ্ধি, রূহ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, অনুভূতি এ সবগুলো সক্ষমতার মাঝে আমি কখনো কোনো বিরোধ দেখিনি এবং ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলায়ও এ সবগুলো সক্ষমতা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা হয়। কারণ বাস্তবতা এমন যে, অনুধাবন করার জন্য আমার সবগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। কার্য এবং কারণের মধ্যকার সম্পর্ক জগতের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। কিন্তু পাশাপাশি আমি একজন মানুষ হিসেবে পাখির কিচিরমিচির আওয়াজ শুনতে চাই, আমি সূর্যোদয় উপভোগ করতে চাই। অস্তিত্বের জগতকে বোঝা এবং এর সৌন্দর্য উপভোগ করাও জগতে আমার দায়িত্বের একটি অংশ। আমি এ সৌন্দর্যকে কতক ভৌত উপাদানে পর্যবসিত করতে পারি না। আর যদি সেটা করি, তাহলে এ সৌন্দর্যকে আমি হারিয়ে ফেলি। এ বস্তুগত ভৌত উপাদানগুলোকে আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দিয়ে অধ্যয়ন করতে পারি, যদি আমি পদার্থবিদ, রসায়নবিদ হই; তাহলে আমি অবশ্যই গন্ধ, নজর, এবং রঙয়ের ভৌত ও রসায়নগত বিশ্লেষণ করতে পারব। কিন্তু আমি জানি রঙ ও গন্ধ এদের ভৌত

উপাদানের চেয়ে বেশি কিছু; এগুলো আমার জীবনে কল্যাণকর হওয়ার পাশাপাশি আমার জন্য আনন্দদায়ক হয়েও হাজির হয়। সুতরাং আমাকে এসব বিভিন্ন ক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে। বস্তুত কোরআন এ ব্যাপারে অনেক স্পষ্ট। কোরআন কেবল মানুষের যুক্তি (আকল), অনুভূতি (ইহসাস বা হিস) ব্যবহার করার কথা বলেনি; কোনো জিনিসকে বোঝাপড়া করার জন্য আপনার □হৃদয়□কে ব্যবহার করার কথাও বলেছে। কার্যত আপনারা এ আয়াতের কথা জানেন, □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ অর্থাৎ, □তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি যেন তারা হৃদয়ের সাহায্য বুদ্ধি বা যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে?□ (২২:৪৬)। সুতরাং ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলায় □হৃদয়□-এর জ্ঞানতাত্ত্বিক কার্যক্রম আছে। কিন্তু আধুনিক দুনিয়ায় আমরা কিছু জিনিস পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছি। ফলে যখন আপনি হৃদয়ের কথা বলেন, দেখবেন অনেকে বলবে□ ও! এসব পুরোপুরি আবেগ, ভাব বিলাসিতা, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার; এর কোনো সত্যতা নাই, সারবস্তু নাই, ভিত নাই। না, ঘটনাটা তেমন নয়। আপনি পৃথিবীর দিকে তাকান, দেখবেন বর্তমান দুনিয়ায় আমোদের আয়ত্তগত ঐশ্বর্যের পাশাপাশি বস্তুগত, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উপকরণ আর সুবিধা দ্বারা আমরা একটা হৃদয়হীন পৃথিবী তৈরি করেছি। আপনি ভোগান্তিময় পৃথিবী, গরিব, শরণার্থী, মজলুম, অবহেলিতদের দিকে তাকান; আপনি ধনী দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সুতরাং ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা যে মূলনীতিগুলো দিয়েছে তা যখনই আমরা ভুলে গিয়েছি, তখনই এর অভাব আমাদের জীবনকে অনেক বেশি জটিল করছে এবং আমাদের পৃথিবীকে অনেক অন্ধকারময় করেছে। সুতরাং যুক্তি ও হৃদয়, তর্কশাস্ত্র ও অলৌকিকতা (Transcendence), লজিকাল ডিসকার্সিভ থিংকিং এর মূলনীতি ও আবেগ-অনুভূতি এবং বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মাঝে কোনো বিরোধ ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলায় নিরূপণ করা যায় না বা দেখা যায়নি।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলামি সভ্যতা বহু প্রতিভার অধিকারী শিল্পী-বিজ্ঞানী-আলেম তৈরি করেছিল। ক্লাসিকাল সময়কাল থেকে আমাদের বিখ্যাত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কেউ কখনো কেবল একটি ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন না। ইবনে রুশদ একজন দার্শনিক ছিলেন, পাশাপাশি একজন বিচারকও ছিলেন। ইবনে সিনা একজন চিকিৎসক, মহাবিশ্ব তত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং একজন ভালো লেখকও ছিলেন। তিনি □সালামান ওয়া আবসাল□, □হাই ইবনে ইয়াকজান□ নামে দার্শনিক উপন্যাসও লিখেছিলেন। আল গাজালি একজন ধর্মতত্ত্ববিদ/ফকীহ ছিলেন; পাশাপাশি একজন সুফি, মুরশিদ, আধ্যাত্মিক নেতা এবং কবি ছিলেন। ইবনে আরাবি ইসলামি সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিজ্ঞান (উলুমুল নাকলিয়্যাহ) এবং বুদ্ধিগত বিজ্ঞান (উলুমুল আকলিয়্যাহ) সহ নানান শাখায় গভীর প্রাজ্ঞ ছিলেন। এভাবে আল বিরুনি থেকে শুরু করে মোল্লা সদরা পর্যন্ত আরো অনেকের নজির আমি দিতে পারি। এ সকল পণ্ডিতদের প্রতিভাই কেবল এ ধরণের বহুমুখী প্রতিভাবান এবং বহুমাত্রিক পাণ্ডিত্য তৈরি করেনি; বরং তারা এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে ওঠেছিলেন। কার্যত পরিবেশ তাদেরকে সুবিধা করে দিয়েছিল; পরিবেশ তাদেরকে এ ধরণের হতে অনেকটা বাধ্যও করেছিল এবং আমরা সত্যিই বর্তমানে এর অভাববোধ করছি। এদিকে আমরা জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় লেগে থাকার চেষ্টা করছি; আর একটি বিশেষ শাখায় যদি একটুখানি দক্ষতা থাকে তখন আমরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করি□ □ও আচ্ছা আমরা তো অনেককিছুই জেনেছি!□; কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। এ ধরণের পাণ্ডিত্য আমাদের সামনে বাস্তবতার অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল ছবি হাজির করে। যদি আপনি জগতকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে চান তাহলে আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক সক্ষমতা ও সরঞ্জামকে অবশ্যই বাস্তবতার সাথে মানানসই হতে হবে, যা আমরা বুঝার চেষ্টা করছি।

তো তথ্য নিয়ে আমার আখেরি মন্তব্য হচ্ছে যা আমরা বলেছিলাম□ যে তথ্য □জ্ঞান□ নয়। জ্ঞান হচ্ছে ভিন্ন কিছু; এবং চিন্তা মানে স্রেফ উপাত্ত বিশ্লেষণ কিংবা তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা নয়, বরং চিন্তা এর চেয়েও বেশি কিছু। সুতরাং আমরা অন্তত আঁচ করতে পেরেছি যে আমাদের চিন্তা কোথায় হওয়া উচিত। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। এমনকি আমাদেরকে তা ছাড়িয়ে যেতে হবে এবং প্রজ্ঞার (হিকমাহ) সন্ধান করতে হবে। তথ্য, উপাত্ত, জ্ঞান, এবং পরিসংখ্যান□ এ সকল কিছু তখনই অর্থপূর্ণ হবে যখন আমরা তাদেরকে প্রজ্ঞা অর্জন করা বা প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছার সরঞ্জামে পরিণত করতে পারব। তাহলে প্রজ্ঞা (হিকমাহ) কী? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা প্রজ্ঞাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যে, যার জন্য কোনো কিছু এমন। অর্থাৎ যার জন্য কোনোকিছুর প্রকৃতি এমন হয়, □প্রজ্ঞা□ তার কারণ অবহিত করে। এটা ব্যাখ্যা করে□ কোনোকিছু এখন যেমন আছে, তেমন কেন হয়। তার মানে, প্রজ্ঞা হচ্ছে□ আমরা যা করি তা যে জন্য করি। কেন এ জগতের অস্তিত্ব আছে? দর্শন, কালাম (থিওলজি), তাসাউফসহ জ্ঞানের অনান্য শাখার সূত্র ধরে এ নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করতে পারি; সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে এক কথায় বললে, জগতের হিকমাহ বা প্রজ্ঞাই হচ্ছে প্রশ্নটির উত্তর। আপনি বলতে পারেন আল্লাহ জগত সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং সেটাই হচ্ছে প্রজ্ঞা। এ কারণেই জগতের অস্তিত্ব আছে। বেশ, আপনারা বলতে পারেন যদি আল্লাহ জগতকে সৃষ্টি না করতেন, তাহলে আল্লাহ অপরিচিত থেকে যেতেন; এটা আবার অন্য ব্যাখ্যা। আপনারা বলতে পারেন যে জগতের চিরকাল অস্তিত্ব আছে; হ্যাঁ, এটাও আবার অন্য ব্যাখ্যা। কিন্তু ঐটা হচ্ছে আসল কারণ, যার জন্য জগত টিকে আছে।

তো আমি মনে করি, মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনার চিন্তাশক্তিতে উদয় হওয়া প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ঐ বিষয় নিয়ে স্রেফ তথ্য ও জ্ঞান জোগাড় করার পদ্ধতিকে অতিক্রম করে যেতে হবে এবং আপনাকে প্রজ্ঞার গভীরে পৌছতে হবে। কারণ হিকমাহ হচ্ছে হুকুম বা

আদেশের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে যে সমস্যা বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বে তা হচ্ছে, আমরা অনেক বেশি হুকুম দিই কিন্তু আমাদের প্রজ্ঞা খুব কম। এমনকি যখন আমরা সন্তানদেরকে ধর্ম শিক্ষা দিই কিংবা আমরা শিখি□ তখন আমরা তাদেরকে নির্দেশ দিই এটা কর, ওটা কর, এটা হালাল, এটা হারাম, ইত্যাদি কিছু; তা ঠিক আছে। কিন্তু প্রজ্ঞার কথা না বুঝিয়ে আমরা আদেশ দিই; কেন আমার অমুক কাজটি পরিহার করা উচিত এবং কেন আমি অমুক কাজটি করব! দেখুন কোরআনীয় তরিকা হচ্ছে যে, একটি মাত্র আদেশব্যবস্থায় আনার পূর্বে কোরআন ১০ বছর যাবত মক্কায় নাযিল হয়েছিল কেবল প্রজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ স্বয়ং দশ বছর সময় অতিবাহিত করেছিলেন জগত সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য; যার সাহায্যে তিনি মুহাম্মাদ □ এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে প্রস্তুত করছিলেন। তিনি প্রথমদিকের মুসলিমদেরকে বুঝিয়েছিলেন কেন তারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, কেন তারা ন্যায্যতার মূলনীতি নিশ্চিত করবে, কেন তাদের বৈষম্য, গোত্রবাদ এবং বর্ণবাদ প্রত্যাখ্যান করা উচিত, কেন তারা জুয়াখেলা, মদ্যপান বন্ধ করবে এবং আরো অন্যান্য অনেক কিছু। এর কারণ ছিল □প্রজ্ঞা□। আর প্রজ্ঞা সবসময় আদেশের পূর্বে আসে। ফলে এমনকি আপনি যখন ফিকহ (আইনশাস্ত্র) অধ্যয়ন করবেন, ফিকহশাস্ত্র হচ্ছে যেখানে আদেশ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ করা হয়, আপনার তখন প্রজ্ঞার মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে□ কেন বিশেষ বিচারিক মূলনীতিকে প্রথম ধাপে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সময়ে আমি মনে করি যদি আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিয়ে চিন্তা করতে হয়, তাহলে আমাদের চিন্তা করা শুরু করতে হবে কী উপায়ে আমরা প্রজ্ঞায় পৌছতে পারি□ তা আমাদের নিজেদের জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য এবং বিশ্বের জন্য। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সূত্রঃ [What is Thinking]

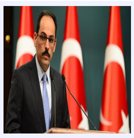

ইব্রাহিম কালিন

ড. ইব্রাহিম কালিন বর্তমান যুগের অনন্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর জন্ম সাবেক উসমানিয়া খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র তুরস্কে। তিনি দর্শন শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন। তিনি তাঁর পিএইচডি ডিগ্রিও নেন দর্শন শাস্ত্রে। তাঁর □পিএইচডি□র সন্দর্ভের শিরোনাম ছিল □Knowledge as Appropriation: Sadr al-Din al-Shirazi (Mulla Sadra) on the Unification of the Intellect and the Intelligible□। তাঁর পিএইচডি অ্যাডভাইসরি বোর্ডে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিকদের অন্যতম ড. সাইয়্যেদ হোসাইন নাসেরও ছিলেন। ডঃ ইব্রাহিম কালিন বর্তমানে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা। এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপ-নিম্নসচিব, প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র উপদেষ্টা ও সরকারী কূটনীতির পরিচালক ছিলেন। তিনি জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের □প্রিন্স আল-ওয়ালিদ সেন্টার ফর মুসলিম-খ্রিস্টিয়ান আন্ডারস্টান্ডিং□ এর একজন সম্মানিত ফেলো।

শিক্ষকতা জীবনে তিনি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। ২০০১ সালে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২ সালে মেরি ওয়াশিংটন কলেজে, ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কলেজ অফ দ্যা হলি ক্রোসে শিক্ষকতা করান। তিনি ২০০৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত □SETA Foundation for Political, Economic and Social Research□, (আঙ্কারা)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০০৮ সালে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ২০১০ সালে বিলকেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, আঙ্কারায় এবং ২০১১ সালে টোব্ব (TOBB) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এসময়ে তিনি যেসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো হলোঃ ইসলাম পরিচিতি, কোর□আন পরিচিতি, ইসলাম ও পশ্চিমা বিশ্ব, ইউরোপ ও মধ্যপ্রচ্য, ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, সুফিবাদ, ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব, তুরস্কে ধর্ম ও রাজনীতি এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে তুরস্ক।

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হলোঃ 1. Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology, Editor-in-Chief; associate editors Salim Ayduz and Caner Dagli, Oxford University Press, 2 Vols. (forthcoming 2014). 2. Mulla Sadra, Oxford University Press (2013). 3. Metaphysical Penetrations, Mulla Sadra, translated by S. Hossein Nasr, edited with notes and introduction by Ibrahim Kalin, Brigham Young University Press, (2013). 4. War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad, edited together with M. Ghazi bin Muhammad and M. Hashim Kamali (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2013). 5. Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century, co-ed. with John Esposito (New York: Oxford University Press, 2011) 6. (ed.) 2000□li Yıllarda Türk Dış Politikası (□Turkish Foreign Policy in the 2000s) (Meydan Yayinlari, İstanbul, 2011). 7. Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra On Existence, Intellect and Intuition, তিনি এছাড়াও অনেক বইয়ের রিভিউ লিখেছেন, লিখেছেন অনেক গবেষণা প্রবন্ধ। বর্তমানে তিনি Daily Sabah পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন। তাঁর ভাষাদক্ষতার আওতায় আছে আরবি, ফারসি, তুর্কি ও উসমানী তুর্কি। এছাড়াও তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন।